অর্থনীতি (৬৫০-১২০০)

অগ্রহার, কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারণ, ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন, কৃষক, মধ্যস্বত্বভোগী, ভূস্বামী, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙ সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। কৃষি সমগ্র উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। চীনা পরিব্রাজক ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায় যে ভারতে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল, বহুরকমের কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন হতো। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, আখ, তুলো, তিল, সরিষা ও নীল ছিল প্রধান। গুপ্তরাজাদের আমলে অগ্রহার ব্যবস্থার চলন হয়, গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ, দেবালয়, মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও বিহারকে ভূমিদান করেন। পূর্ব ভারতের পাল, পশ্চিম ভারতের বকাটক ও দক্ষিণের চোল রাজারা ভূমিদান করেন। গুপ্তরাজাদের তাম্রশাসনগুলি হলো জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল। ধনীরা জমি কিনে ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দান করত (ব্রহ্মদেয় ও দেবদান)। এইসব জমির বেশিরভাগ ছিল পতিত ও অনাবাদী। এইসব জমির সীমানা চিহ্নিত করে রাজারা হস্তান্তর করতেন। বিক্রয় ও দানের পর পুরোহিত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেসব ভূমি লাভ করত তা ছিল স্থায়ী, এর আর পরিবর্তন হতো না। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ জমি যা হস্তান্তরিত হয়েছিল তার বেশিরভাগ ছিল পতিত জমি, অনাবাদী। ব্রাহ্মণ ও মন্দির এগুলির ওপর পুরো মালিকানা লাভ করেছিল। মধ্যভারত, পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যে এই পর্বে যেসব জমি অগ্রহার হিসেবে দেওয়া হয় তাতে অবশ্য চাষবাস ছিল। রাজারা এগুলি ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দান করতেন, রাজারা ভূখণ্ড বা গ্রাম দান করতেন, ভূমিদান করার সময় রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী, গ্রামের সম্ভ্রান্ত মানুষ ও কৃষক উপস্থিত থাকত।

পশ্চিম ভারতে বকাটক আমলে পঁয়ত্রিশখানি গ্রাম অগ্রহার হিসেবে দান করা হয়েছিল। তবে গ্রাম দান করা হলেও গ্রামের ওপর সব অধিকার দানগ্রহীতা পেত না, গ্রাম থেকে তিনি প্রাপ্য রাজস্ব ভোগের অধিকারী হন। গ্রাম ছাড়াও ব্রাহ্মণদের ভূখণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মানুষ অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ জানিয়েছেন যে বৌদ্ধ বিহারগুলিও প্রচুর ভূসম্পদের অধিকারী ছিল। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা জানিয়েছেন যে দানগ্রহীতা শুধু রাজস্বের অধিকারী হতেন না, তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং

বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পেতেন। অগ্রহার মালিক প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত অধিকার লাভ করতেন। দানগ্রহীতারা তাঁদের সম্পত্তি চাষবাসের জন্য কৃষক নিয়োগ করতেন, অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে ভূমিব্যবস্থায় অবশ্যই পরিবর্তন ঘটেছিল। রাজা ও কৃষকের মধ্যবর্তী স্থলে মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে। অগ্রহার ব্যবস্থায় দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ, মন্দির, বৌদ্ধ বিহার সব ভূম্যধিকারী হয়ে বসেছিল। রামশরণ শর্মা মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে রাজকোষের আয় কমেছিল, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও বাজেটের ওপর চাপ পড়েছিল। হর্ষবর্ধন তাঁর আয়ের এক-চতুর্থাংশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য ব্যয় করতেন। অন্যদিকে আধুনিক গবেষকরা দেখিয়েছেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, অধিকাংশ অগ্রহার জমি ছিল পতিত ও অনাবাদী। অনেকক্ষেত্রে অনাবাদী জমি বিক্রি করে রাজা আয় বাড়িয়ে নিতেন। অনাবাদী জমিতে চাষাবাদ বসানো হয়, কৃষ্ণমোহন শ্রীমালী এধরনের কৃষি সম্প্রসারণের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনগুলিতে অনাবাদী জমি পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দেওয়া হতো বলে জানা যায়। সপ্তম শতকে শ্রীহট্টের সামন্ত লোকনাথ দুশো ব্রাহ্মণকে যে অগ্রহার দেন তা ছিল অরণ্যের মধ্যে। ঐ অরণ্যে আগে জনবসতি ও কৃষিকাজ ছিল না। অষ্টম শতকে সামন্ত মরুণ্ডনাথ জঙ্গল ও জলাজমিতে একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করে অগ্রহারের ব্যবস্থা করেন। অগ্রহার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কৃষক ও অন্যান্য পেশাদার (কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি) গোষ্ঠীর মানুষরা সেখানে গিয়ে হাজির হতো। পরিত্যক্ত অরণ্য, জলাভূমি ও পতিত জমি আবাদী ও বসতিপূর্ণ হয়ে উঠত। রামশরণ শর্মা স্বীকার করে নিয়েছেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে শুধু সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়নি, কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষির আওতায় এসেছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে রাজার আয় কমেছিল এই মত মেনে নেওয়া যায় না। বরং কৃষিজ উৎপাদন ও জনবসতি বৃদ্ধি পাবার জন্য রাজার আয় বেড়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে পল্লব আমলে অগ্রহার ব্যবস্থার মাধ্যমে অরণ্য ধ্বংস করে বসতি স্থাপন ও কৃষির প্রসার ঘটানো হয়েছিল। এই পর্বে কৃষির প্রসার ঘটেছিল। কৃষির সম্প্রসারণের নজির হলো কৃষি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়। *কৃষি পরাশর, কৃষিসূক্তি* হলো কৃষিবিদ্যা সম্পর্কিত রচনা। *শূন্য পুরাণে* বলা হয়েছে যে প্রাচীন বাংলায় অন্তত পঞ্চাশ রকমের ধান উৎপন্ন হতো। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলহরি (জব্বলপুর) লেখতে শাক ও বার্তাকুর উল্লেখ আছে। ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূলভাগ জুড়ে প্রচুর নারকেল উৎপন্ন হতো। দক্ষিণ ভারত, কোঙ্কন, আসাম ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় প্রচুর পরিমাণে গুবাক (সুপারি) উৎপন্ন হতো। সুপারির পাশাপাশি পানের চাষ ছিল বলে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পান উৎপন্ন

হতো। উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল কার্পাস ও তৈলবীজ। সমকালীন লেখতে এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণীতে দক্ষিণ ভারতে তুলো চাষের কথা আছে। চীনা লেখক চাওজুকুয়া *চু-ফান-চি* (১২২৫) গ্রন্থে জানিয়েছেন পংকিলো বা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশে তুলো চাষ হতো। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে ভালো তুলো উৎপন্ন হতো। এই অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা তুলো চাষের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। ভারতে মশলার চাষ ছিল, মালাবার অঞ্চলে গোলমরিচ উৎপন্ন হতো। আদি মধ্যযুগের লেখমালায় এবং আরব লেখকদের রচনায় মালাবার অঞ্চলে মশলা চাষের কথা জানা যায়। কলহণ জানিয়েছেন যে কাশ্মীরে জাফ্রানের চাষ ছিল। গুজরাটের লেখতে কর্পূর, হিং, অগুরু, জায়ফল, জৈত্রী, মরিচ ও খেজুরের উল্লেখ আছে। এরমধ্যে কিছু ফল ও ফসল হয়তো পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চাষ হতো। মরিচ গুজরাটের বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। বহু ধরনের কৃষিজ ফসল প্রমাণ করে যে ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, কৃষি অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছিল।

হালভিত্তিক চাষের সম্প্রসারণের জন্য কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্য বেড়েছিল। চহমান বিগ্রহরাজের হর্ষ লেখতে (৯৭৫) 'বৃহদহলের' (বড় লাঙল) কথা জানা যায়। মঙ্খকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে হল ছিল অধিকাংশক্ষেত্রে কাঠের তৈরি। কৃষিপ্রধান জীবনে ঢেঁকির ব্যবহার বেড়েছিল। দামোদর গুপ্তের *কুট্টনীমতম*, কলহণের *রাজতরঙ্গিণী*, *সুভাষিত রত্নকোষ* ও শ্রীধর দাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এ ঢেঁকির উল্লেখ দেখা যায়। ঢেঁকি ছাড়া উদুখলের ব্যবহার ছিল, হেমচন্দ্র এই উদুখলের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো সেচব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে সেচব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল। আদি মধ্যযুগে শ্রেষ্ঠ সেচব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায় কাশ্মীরে। কলহণ কাশ্মীরের সেচব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বিতস্তার বন্যার প্রকোপ থেকে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য সূর্য নামক এক ব্যক্তি রাজা অবন্তীবর্মার শাসনকালে (৮৩৬-৫৫) অসামান্য প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে বিতস্তার গতিপথ পরিবর্তন করে দেন। এর ফলে বন্যার হাত থেকে দেশবাসী রক্ষা পায়, কাশ্মীরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, বাজারে ধানের দাম সস্তা হয়েছিল। এরকম নদীতে বাঁধ দিয়ে জলসেচ গড়ে তোলার নজির আর নেই। এযুগে সেচের জন্য কূপের জল ব্যবহার করা হতো। গভীর কূপ (বাপী) খনন করে চাষের জমিতে জল সরবরাহ করা হতো। গুজরাট ও রাজস্থানে কূপের জলে চাষ হতো। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে কূপের প্রধান কাজ ছিল কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা। অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় রাজস্থানের সেচব্যবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

এই পর্বে সেচের প্রধান যন্ত্রটি হলো অরঘট্ট, এটি আবার ঘটিযন্ত্র, উদ্‌ঘাটক ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এই চক্রাকার যন্ত্রটির গায়ে অনেক ঘটি বসানো থাকত, চক্রটি

ঘুরলে ঘটি জলভর্তি হয়ে চাষের জমিতে ছড়িয়ে দিত। রাজস্থানের মান্দোরের ভাস্কর্যে অরঘট্টের রূপটি ধরা আছে। অনেকে এই যন্ত্রটিকে পারস্য দেশীয় চাকাযন্ত্র বলে (Persian wheel) উল্লেখ করেছেন। ইরফান হাবিব জানিয়েছেন যে ভারতের অরঘট্ট এবং পারস্যের চক্র এক নয়। পারস্যের চাকায় দুটি অংশ ছিল, দুটি অংশের মধ্যে একটি 'গিয়ার' থাকত। অনুভূমিক চাকাটি ঘুরলে ওপরের চাকাটিও ঘুরত, ঘটি ভর্তি হয়ে জল কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা সম্ভব হতো। ইরফান হাবিব মনে করেন যে এই দ্বিতীয় যন্ত্রটি তুর্কি অভিযানের আগে ভারতে আসেনি। রাজস্থানে অরঘট্ট বলতে গভীর কূপকেও বোঝাত। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতা চট্টগ্রাম থেকে কামরূপ যাবার পথে চক্রাকার এই যন্ত্রটিতে জল তুলতে দেখেছিলেন। সেচব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রাধান্য পেয়েছিল। রাজারা অনেকসময় বড় জলাশয় খনন করে কৃষিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা করে দিতেন। সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত-এ বরেন্দ্র অঞ্চলে বিশাল দীঘির কথা উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে চোলরাজারা 'চোল বারিধি' নামে জলাশয় নির্মাণ করে দেন। দক্ষিণ ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার তদারকি করত গ্রামসভাগুলি। উর ও ব্রাহ্মণদের মহাসভাগুলি জলাশয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণ, জলবন্টন, কর আদায় ইত্যাদি কাজ করত। গ্রামসভার অন্তর্ভুক্ত সেচ সমিতির সদস্যরা শ্রমিক নিয়োগ করে জলাশয়গুলি পরিষ্কার করত, জলাশয়ের গভীরতা বাড়াত, জলবন্টনের ক্ষেত্রেও গ্রামসভাগুলির প্রাধান্য ছিল।

৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছিল, বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরগুলি ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। পূর্ব ভারতের বৌদ্ধবিহার নালন্দার অধীনে ছিল ২০৯টি গ্রাম। বাংলার চন্দ্র, বর্মন, সেন প্রভৃতি রাজবংশগুলি প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। সেন আমলের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মার বহু সম্পত্তি ছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রতিহার শাসকেরা অগ্রহার ব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছেন, কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদানের নজির নেই। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজারা ব্যাপকভাবে ভূমিদান করেন, একজন রাষ্ট্রকূট রাজা ১৪০০ গ্রাম দান করেন। দক্ষিণ ভারতে 'ব্রহ্মদেয়' ও 'দেবদানের' অজস্র নজির ছড়িয়ে আছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি ভূম্যধিকারী হয়ে বসেছিল, ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। ভূস্বামীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, ভূমিব্যবস্থায় জটিলতা যে বেড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে, ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যবর্তী স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ধর্মশাস্ত্রে ত্রিস্তর বিশিষ্ট ভূমিব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়—রাজা, ভূস্বামী ও কৃষক। ভূস্বামী জমি নিজে চাষ করতেন না, এজন্য তাঁকে কৃষক নিয়োগ করতে হতো।

মালিকানাহীন কৃষি-শ্রমিকের উদ্ভব হয়েছিল, বৃহৎ ভূস্বামী এদের নিয়োগ করে কৃষি উৎপাদনের কাজ চালাতেন। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়াও ভোগাধিকারের মালিকানা তৈরি হয়েছিল। জমির কর্ষক ও ভোগাধিকারী ছিল আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রহার জমিতে কৃষকের মালিকানা ছিল না। নালন্দার মহাবিহার এবং দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগুলি নিজেদের ভূসম্পত্তি চাষিকে দিয়ে চাষ করাত। রাজস্থান, মালব ও গুর্জর দেশের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে দানগ্রহীতা নিজে জমির উপস্বত্ব ভোগ করবেন, অন্যকে ভোগ করতে দেবেন (ভুঞ্জ তো ভোজাপয়তঃ), চাষিকে দিয়ে চাষ করাবেন বা নিজে চাষ করবেন। মধ্যস্বত্বের ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। ভূস্বামী অন্যকে জমির উপস্বত্ব ভোগ করতে দিতে পারেন, তাতে কোনো বাধা নেই। কৃষি অর্থনীতিতে বিভিন্ন স্তরের উদ্ভব ঘটেছিল। ভূস্বামীদের ভূখণ্ডের সীমা চিহ্নিত ছিল, তা সত্ত্বেও ভূস্বামীরা পার্শ্ববর্তী চারণভূমিতে চাষ বসিয়ে আয় বাড়াতে পারতেন। রাষ্ট্রকূট রাজারা অবশ্য দানগ্রহীতাদের বাড়তি সুবিধা দেননি। পাল ও সেন রাজারা জমি ছাড়াও ফলের বাগান, পতিত জমি, জলা জমি ইত্যাদি দানগ্রহীতাকে ভোগের জন্য দেন। ওড়িশাতে মাছ ও কচ্ছপের অধিকারও দানগ্রহীতাকে দেওয়া হয়। শর্মা মনে করেন যে অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের ও যৌথ মালিকানার অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে নোবুরু কারাশিমা দেখিয়েছেন যে উর অঞ্চলের গ্রামসভা যৌথভাবে গ্রামের মালিকানা ভোগ করত, জমি থেকে গ্রামের সকল অধিবাসী উপকৃত হতো। ব্রহ্মদেয় গ্রামগুলিতে ব্রাহ্মণ ভূস্বামীরা ছিলেন। কারাশিমা চোল রাজবংশের শেষপর্বের লেখ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি জমি বিক্রি করছেন মন্দিরকে, গ্রামসভার উপস্থিতি চোখে পড়ে না। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে দক্ষিণ ভারতের ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটেছিল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ভূস্বামীদের উত্থানের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। ভূস্বামী জমির ওপর 'কানি' অধিকার পান অর্থাৎ ভোগদখলের অধিকার লাভ করেন। এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলে গিয়ে জমি কিনে ভূস্বামী হয়ে বসেন। চোল সৈনিকরা জমি কিনে ভূস্বামী হয়ে বসেছিল এমন নজির পাওয়া যায়। জমিতে যৌথ অধিকার সঙ্কুচিত হয়, কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়েছিল, মালিকানা হারিয়েছিল।

শর্মা জানিয়েছেন যে ভূস্বামীরা শুধু জমির অধিকার লাভ করেননি, শাসন ও বিচারের অধিকারও পেয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর অফিসার, রাজকর্মচারীও জমি কিনে ভূস্বামী হয়ে বসেছিল। এইসব ভূস্বামী রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অধীনস্থ ভূস্বামীরা সম্ভবত রাজাকে কর দিতেন, রাজাকে কর দিয়ে সন্তুষ্ট রেখে তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় যথেচ্ছ রাজস্ব বাড়াতে পারতেন। অধীনস্থ জনগণের

কাছ থেকে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতেন। সামন্তরাজারাও ভূমিদান করতেন। ভূস্বামীরা শক্তিশালী হলে শাসন ও বিচারব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত রূপ নিতে থাকে। বাংলার রাজা রামপাল সামন্তদের সাহায্য লাভের জন্য তাঁদের ভূসম্পত্তিসহ বহু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন, রাজার সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূস্বামীদের এবং তাঁদের অধীনস্থ মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়লে, রাজশক্তি দুর্বল হলে, কৃষকের অবস্থার অবনতি ঘটে। কৃষকদের সকলে মালিকানাহীন ছিল না, অনেকের জমি ছিল, আদি মধ্যযুগে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এই পর্বে কৃষকের প্রতিশব্দ হল 'হালকর' বা 'বদ্ধহল'। এই কৃষক শুধু জমি চাষ করে, জমির মালিকানা সম্ভবত তার ছিল না। *পদ্মপুরাণ*-এ চাষিদের দুরবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। কৃষকের দারিদ্র্য, পাশাপাশি ভূস্বামীদের বিলাস-ব্যসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *স্কন্দপুরাণ*-এ ইঙ্গিত আছে যে কলিযুগে রাজা প্রজাপীড়ন করবেন। কর ও নানাধরনের আইন-বহির্ভূত উপঢৌকন আদায় করা হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের লেখমালায় অসংখ্য করের উল্লেখ আছে, করের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়ে গিয়েছিল। চোল রাজারা করের সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন, নির্দিষ্ট কর ছাড়াও অতিরিক্ত কর আদায় করা হতো। কর বাড়লে কৃষকের দুর্গতি বেড়েছিল। দানগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট কর ছাড়াও 'উচিত-অনুচিত' কর ও 'বিষ্টি' (বেগার শ্রম) আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। কলহণ জানিয়েছেন কাশ্মীরের রাজারা কৃষকের হাতে ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা রেখে বাকি সব গ্রাস করতেন। যাদব দেখিয়েছেন কৃষককে বলা হয়েছে 'আশ্রিত হালিক'। শর্মা ও যাদব মনে করেন যে কৃষককে সম্ভবত ভূমিতে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা ছিল। কৃষক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারিয়েছিল, কোসাম্বী জানাচ্ছেন যে ভূস্বামীদের অত্যাচারের ফলে কৃষকেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেত।

অত্যাচারের মাত্রা ছাড়ালে কৃষক সম্ভবত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। শুধু প্রতিবাদ নয়, সম্ভবত তারা প্রতিরোধও গড়ে তুলত, সমকালীন সাহিত্যে এর নজির আছে। পাল আমলের কৈবর্ত বিদ্রোহ হলো কৃষকের প্রতিবাদী আন্দোলনের একটি নিদর্শন, কৃষকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। *রামচরিত*-এ অবশ্য বলা হয়নি যে দিব্য কৃষকদের নেতা ছিলেন। হেমচন্দ্র জানিয়েছেন যে কৃষকদের শ্রেণী বা সংগঠন ছিল, প্রয়োজন হলে তারা দলবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করত, প্রতিরোধ গড়ে তুলত। ত্রয়োদশ শতকে কৃষক প্রতিরোধের ঘটনা একেবারে বিরল নয়।

শহরের বিকাশ

কৃষির প্রসার, শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যের বিস্তার নগরায়ণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে এই পর্বে ভারতে নগরজীবনে অবক্ষয় দেখ

❑ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ঃ প্রসঙ্গ ও বির্তক (Indian feudalism, Issues and debates) ঃ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে (৪৭৬ খ্রীঃ) বর্বরদের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। পরবর্তী প্রায় হাজার বছর ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। এই পর্বে পশ্চিম ইউরোপে এক নতুন ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ধারা গড়ে উঠেছিল। আর্থ-রাজনৈতিক এই ক্রম-বিকাশমান ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সামন্তপ্রথা (Feudal System)। এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির ক্রম-অবক্ষয় এবং সামন্তপ্রভুদের নেতৃত্বে আঞ্চলিক প্রভুত্বের বিকাশ। এই পর্বে নগরায়ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ সংকুচিত হয়েছিল এবং ভূমিভিত্তিক স্বনির্ভর অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন সামন্তরা। উৎপাদনের মুখ্য উপাদানগুলির উপর ছিল এই ভূম্যধিকারী শ্রেণীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এদের সৈন্যবল ও অর্থবল দুই-ই ছিল। রাজতন্ত্র কোন কোন অঞ্চলে অস্তিত্ব বজায় রাখলেও, তার কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি মূল উৎস ছিল সামন্তশ্রেণীর সমর্থন ও সহযোগিতা।

ইউরোপের আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপান্তর ও যুগবিভাজনের ভিত্তিতে অধুনা ভারত-ইতিহাসেরও যুগবিভাজন করা হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে ইতিহাসের কালবিভাজনের প্রচলিত এবং বহুলাংশে অযৌক্তিক রীতি পরিহার করে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের যুগবিভাজন স্বীকৃতি পেয়েছে। এইভাবে সপ্তম থেকে দ্বাদশ (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ) শতকের মধ্যবর্তী সময়কে *'আদি মধ্যযুগ'* বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আদি মধ্যযুগ

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, মার্কসীয় ব্যাখ্যানুযায়ী 'এশিয়ার উৎপাদন পদ্ধতি' বিষয়ক বিশ্লেষণ প্রাচীন ভারতের উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্যক প্রযোজ্য নয়। এ সত্য আজ প্রমাণিত যে, প্রাচীন ভারতে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল, সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ ছিল এবং নগর-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করা যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে 'দাস'-প্রথার অস্তিত্ব ও ব্যাপকতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মেগাস্থিনিস লিখেছিলেন, *"সব ভারতীয় স্বাধীন এবং তাদের মধ্যে একজনও দাস নেই।"* মেগাস্থিনিসের বক্তব্য নিশ্চিতভাবেই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জাতক কাহিনী, অশোকের অনুশাসন, মনুসংহিতা, বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র (যেমন—যাজ্ঞবল্ক, নারদ, কাত্যায়ন) ইত্যাদিতে প্রাচীন ভারতে দাস-ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের দাস-ব্যবস্থার সাথে মধ্যযুগের ইউরোপের ক্রীতদাস বা ভূমিদাস-ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে এটিকে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যথার্থ নয়। বস্তুত ভারতীয় দাস-প্রথার সাথে প্রাচীন গ্রীস বা রোমে প্রচলিত দাস-প্রথার কোনও সাদৃশ্য নেই। সম্ভবত এই কারণে মেগাস্থিনিস ভারতে দাস-প্রথা নেই বলে মন্তব্য করেছেন। আসলে ভারতে দাস-প্রথা ছিল ; কিন্তু তথাকথিত 'দাস-সমাজের' অস্তিত্ব ছিল না। ভারতে 'দাস' নামে কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী বা জাতির অস্তিত্ব ছিল না। এখানে বিভিন্ন বর্ণ বা শ্রেণীর মানুষ নানা কারণে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হত। আবার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ উদ্ভাবনে সমাজপতি বা প্রশাসকরা যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিধান উল্লেখ্য। সর্বোপরি ভারতের উৎপাদন-ব্যবস্থা একান্তভাবে দাস-শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল না। স্বভাবতই প্রাক্-গুপ্ত ভারতবর্ষে পশ্চিম-ইউরোপীয় ধাঁচের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের উৎস খোঁজা সঠিক নয়।

দাসপ্রথা

প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশতত্ত্বটি প্রথম উত্থাপন করেন *ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ড. রামশরণ শর্মা* ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উত্থান ও প্রসারের বিষয়টিকে জোরালো রূপ দেন। মার্কসবাদী নেতা *এস. এ. ডাঙ্গে* পরবর্তী বৈদিক যুগে 'দাস' সমাজের অস্তিত্বের ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব তত্ত্বের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন *অধ্যাপক বি. এন. এস. যাদব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝা, এস. গোপাল, ভকতপ্রসাদ মজুমদার* প্রমুখ। সাধারণভাবে সামন্ততন্ত্রের সূচনা, বিকাশ ও অবক্ষয়ের পর্ব হিসেবে এঁরা খ্রীষ্টীয় ৩০০ থেকে ১২০০ অব্দকে নির্দিষ্ট করেছেন। সামন্ত-ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটেছিল ৩০০-৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ৬০০-৯০০ খ্রীষ্টাব্দ ছিল এর বিকাশকাল। সামন্ত-প্রথার চূড়ান্ত প্রকাশ ও অবক্ষয়ের সূচনাকাল ছিল ৯০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। *ড. শর্মার* এই কালবিভাগের কিছুটা বিরোধিতা করেছেন *ড. নরুল হাসান।* তাঁর মতে, মুঘল আমলেও সামন্ত-প্রথার অস্তিত্ব ছিল। এই বিতর্কে নতুন মাত্রা দিয়েছেন *ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, হরবনস্ মুখিয়া, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, রণবীর চক্রবর্তী* প্রমুখ গবেষক-ঐতিহাসিক। এঁরা মনে করেন, প্রাচীন ভারতে কোন সময়েই পশ্চিম-ইউরোপের আদলে তথাকথিত 'শুদ্ধ সামন্ততন্ত্র' ছিল না। উভয় পক্ষের যুক্তি বিশ্লেষণ করলে আমরা হয়তো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব।

ভারতে সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্ব

ড. শর্মা প্রমুখ চতুর্থ শতকের সূচনা ও পরবর্তীকালের প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েকটি পরিবর্তনের ভিত্তিতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। *ড. শর্মা লিখেছেন, "মৌর্যোত্তর কালে এবং বিশেষত গুপ্তদের আমলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের কোন কোন দিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রের অভিমুখী করেছিল।"* এ কাজে প্রধান

উপাদান ছিল জমির উপর রাজকীয় এবং গোষ্ঠী-মালিকানা হ্রাস এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার। এই পরিস্থিতির মূল উৎস ছিল 'অগ্রহার' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্মস্থান বা ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে নিষ্কর ভূমিদান। খ্রীষ্টীয় ৩০০ শতকেও এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তবে রাজাদের পাশাপাশি অর্থশালী ব্যক্তিবর্গও এই দান কার্য করতেন। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পর শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই ধরনের দান পেতে থাকেন এবং দাতা হিসেবে শাসকগোষ্ঠী প্রধান ভূমিকা নেন। দানগ্রহীতা প্রাপ্ত জমি ও গ্রাম থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব ভোগ করার পাশাপাশি গ্রামীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও ভোগ করতেন। এই ভাবে দানগ্রহীতা ক্রমে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মুখ্য পরিচালকে পরিণত হন। ধীরে ধীরে যোদ্ধাদেরও গ্রামদান ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সমকালীন স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে ভূমি-ব্যবস্থার তিনটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে— (১) মহীপতি, (২) স্বামী, (৩) কর্ষক। এক্ষেত্রে প্রথমজন ছিলেন স্বয়ং রাজা। দ্বিতীয়জন জমির প্রাপক এবং তৃতীয় স্তরে ছিল কৃষককুল, যাদের শ্রমে উৎপাদন সম্পন্ন হত। এইভাবে 'অগ্রহার' ব্যবস্থা থেকে একটি ভূম্যাধিকারী শ্রেণী এবং একটি শোষিত কৃষকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যাকে 'সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রদূত' বলা যায়।

'অগ্রহার'-প্রথা

ঐতিহাসিক *ডি. ডি. কৌশাম্বী* মনে করেন, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে ভারতের রাজারা তাঁদের অধীনস্থ নৃপতিদের কাছে কিছু জমির রাজস্ব আদায় ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ফলে কৃষকদের সাথে স্থানীয় উপ-শাসকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থাকে তিনি 'উপর থেকে সামন্ততন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। সপ্তম-অষ্টম শতকে রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝে একটি ভূস্বামীশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। তাঁর ভাষায় এটি হল 'নিচু থেকে সামন্ততন্ত্র'। অবশ্য ড. *শর্মা* এই বিভাজন মানতে অস্বীকার করেছেন এবং অগ্রহার ব্যবস্থাকেই গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের প্রধান উপাদান বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ এখান থেকে ভূমিব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানার প্রসার ঘটে এবং ভূস্বামীশ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। পাল আমলের ''আমগাছি তাম্রশাসন'' উল্লেখ করে ড. *শর্মা* সামন্তগণ কর্তৃক অধীনস্থ উপ-সামন্ত সৃষ্টির উপস্থাপিত করেছেন। এইভাবে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে কেন্দ্রাভিগতার পরিবর্তে কেন্দ্রাতিগতার প্রাধান্য ঘটেছে।

ড. কোশাম্বীর মত

ড. *শর্মা, যাদব* আরো দেখিয়েছেন, সামন্ত-ব্যবস্থার আগে কৃষক বা রায়তদের বোঝাতে *'গৃহপতি', 'কুটুম্বী'* প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আদি মধ্যযুগে কৃষকের প্রতিশব্দ হিসেবে *'হালকর'* বা *'বদ্ধহল'* শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। ভূমির মালিকানা-বঞ্চিত কেবল শ্রমদানে বাধ্য এই কৃষকশ্রেণীর উল্লেখ সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বকে সমর্থন করে। এঁরা মনে করেন যে, একান্তভাবে কৃষি-অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই আদি মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্র বিকশিত হয়েছিল। নারদপুরাণে কলিযুগের কৃষককে 'বদ্ধহল' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *শর্মার* মতে, এই ব্যাখ্যা কৃষকের দাসত্বের তত্ত্বকে সমর্থন করে। ড. *যাদব* 'আশ্রিত হালিক' শব্দটিকে কৃষকের ভূমিতে আবদ্ধ থাকার প্রমাণ রূপে উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্য *ডি. ডি. কৌশাম্বী* কিছুটা উদারভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। 'সুভাষিত রত্নকোষ' গ্রন্থের একটি কাহিনী উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, জনৈক ভূস্বামীর অত্যাচারের ফলে কৃষকেরা

কৃষকের বদ্ধ জীবন

তাদের জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। অর্থাৎ ইউরোপের মত ভারতীয় কৃষকেরা তথাকথিত সংকটের কালে (কলিযুগে) জমির সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না।

দশম শতকে রচিত সোমদেব-এর 'নীতিবাক্যামৃতম্' গ্রন্থে কৃষিকাজকে সকল বর্ণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *অধ্যাপক শর্মা ও যাদব* এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে শিল্প ও বাণিজ্যের অবক্ষয়ের সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করেন। স্কন্দ পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিতে কলিযুগে বৈশ্যদের বাণিজ্যবৃত্তি বর্জন করে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করার আভাস দেওয়া হয়েছে। সপ্তম-অষ্টম শতকে 'অগ্রহার'-ব্যবস্থার বিকাশের ফলে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনে কৃষকদের আদৌ আগ্রহ ছিল না। ফলে উদ্বৃত্ত পণ্যের উৎপাদন হত না। এই অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। ড. *শর্মা* সমকালে মুদ্রা ব্যবহারের স্বল্পতা দ্বারা বাণিজ্য-হ্রাসের তত্ত্বকে সমর্থন করেছেন। হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে মুদ্রা প্রণয়ন ও ব্যবহারে স্থানীয় শাসকদের (যেমন— বকাটক, পাল, সেন) উদাসীনতা শর্মার মতকে সমর্থন করে।

বাণিজ্য-হ্রাস

শিল্প-বাণিজ্যের অবনতির ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নগরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। জিন প্রভসুরীর *'বিবিধার্থকল্প'* গ্রন্থের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ড. *যাদব* বলেছেন যে, আদি মধ্যযুগে নগরগুলি গ্রামের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ উদ্ধৃত করে ড. *শর্মা* দেখিয়েছেন যে, ঐ সময় গাঙ্গেয় উপত্যকায় বহু সমৃদ্ধ নগর অবক্ষয়ের পথে চলছিল। এই ধরনের কয়েকটি অবক্ষয়প্রাপ্ত নগর ছিল শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী প্রভৃতি। খ্রীষ্টীয় ৩০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নগরের অবক্ষয় সর্বভারতীয় রূপ পেয়েছিল। এই পর্বে বহু নগর একপ্রকার পরিত্যক্ত হয়েছিল। অধিকাংশের অবস্থা ছিল হতদরিদ্র। নগরের এই অবক্ষয়কে *শর্মা, যাদব* প্রমুখ সামন্ত-ব্যবস্থার অন্যতম প্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। *শর্মার* মতে, *'আর্থিক রক্তাল্পতা'* (Monetary anaemia) এবং *'নগরের রক্তাল্পতা'* (Urban anaemia) আদি মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।

নগরের অবক্ষয়

যে সকল তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে *রামশরণ শর্মা, বি. এন. যাদব* প্রমুখ আদি-মধ্যযুগীয় ভারতে সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কথা বলেছেন ; অনেকেই তা মানতে অস্বীকার করেছেন। ড. *রণবীর চক্রবর্তী* প্রমুখ মনে করেন, ৬০০ থেকে ১০০০ কাল পর্বে দাসভিত্তিক কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ, মুদ্রাশিল্প ও বাণিজ্যের অবক্ষয়, নগরের পতন ইত্যাদি বিষয়ে শর্মা প্রমুখের বিশ্লেষণ একপেশে। ড. *সরকার* আদি মধ্যযুগীয় তাম্রশাসনগুলি বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'অগ্রহার' ব্যবস্থা রাজার ক্ষমতা হ্রাস বা মুদ্রা-অর্থনীতির অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয় না। ড. ***রণবীর চক্রবর্তী*** লিখেছেন, *"অগ্রহার নীতিতে অন্তর্বর্তী ভূম্যধিকারীর উত্থান মেনে নিলেও তার দ্বারা রাষ্ট্রের আর্থিক ও সার্বভৌম অধিকার সঙ্কুচিত বা বিপন্ন হত কিনা বলা কঠিন।"* এঁদের মতে, 'অগ্রহার' ব্যবস্থার ফলে রাজার অর্থ বা প্রতিপত্তি হ্রাস পেত না, বরং বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। ড. *চক্রবর্তী* সমকালীন রাজ-অনুশাসন উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, রাজা দানগ্রহণকারী ব্যক্তিদের রাজ-বিরোধী কোন প্রকার কাজ থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশ জারী করতেন। প্রয়োজনে প্রদত্ত জমি কেড়ে নেবার হুমকিও দেওয়া হত। ড. ***সরকার*** মনে করেন, লেখগুলির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে

মত বিরোধ

একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না যে প্রাপ্ত ভূখণ্ডের কর-সংগ্রহের অধিকারও দানগ্রহীতার হস্তগত ছিল। তিনি কর-সংক্রান্ত কিছু অনুশাসন উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, রাজা বিশেষ আদেশনামা জারী করে 'অগ্রহার'-ভুক্ত এলাকা থেকেও কর সংগ্রহ করতে পারতেন। ড. সরকারের মতে, অগ্রহার-ব্যবস্থা ও রাজকোষের দুর্বলতার মধ্যে যোগসূত্র খোঁজা অযৌক্তিক।

পরন্তু ড. *শর্মা*ও স্বীকার করেছেন যে, অগ্রহার সৃষ্টির দ্বারা অনেকক্ষেত্রেই অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। পাল-পূর্ব বাংলার একাধিক তাম্রশাসন থেকে

অগ্রহার ব্যবস্থার সুফল

জানা যায় যে, অনাবাদী, জঙ্গলাকীর্ণ বহু অঞ্চল 'অগ্রহার' দানের ফলে লোকালয়ে পরিণত হয়েছিল এবং কৃষি-উপাদান সম্প্রসারিত হয়েছিল।[১] ড. *চক্রবর্তী* লিখেছেন, "*এ কথা অস্বীকার করা কঠিন হবে যে, অগ্রহার করার বহু ঘটনাতেই পতিত, অনুর্বর, অনুৎপাদক জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল।*" দানগ্রহীতা অনিবার্যভাবেই ঐ জমিকে উৎপাদনের উপযোগী করে তুলতেন। ফলে লাভবান হত রাষ্ট্রই।

সামন্ততান্ত্রিকতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামন্ত-প্রভুদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে চুক্তি (Contract)। কিন্তু আদি মধ্যযুগের ভারতে এই দুটি উপাদান ছিল খুবই শিথিল। হরবন্‌স মুখিয়া মনে করেন যে, আলোচ্য পর্বে ভারতে উৎপাদনের উপকরণের উপর সামন্তদের নয়—কৃষকদেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় ছিল।

চুক্তি'-প্রথার অনুপস্থিতি

ফলে ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কে দানা বাঁধতে পারে নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে 'ভূমিদাস' প্রথার তদর্থে অস্তিত্ব ছিল না। জমির সাথেও তারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। *দ্বিতীয়ত*, সামন্ত-ব্যবস্থায় চুক্তির গুরুত্ব অসীম। এই চুক্তির দ্বারাই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ক্রমোচ্চস্তরের পারস্পরিক আনুগত্য গড়ে ওঠে। কিন্তু আদি মধ্যযুগে এই গুরুত্বপূর্ণ শর্তটিই অনুপস্থিত ছিল। ড. *রণবীর চক্রবর্তী* লিখেছেন, "*এ বিষয়ে সমকালীন তথ্য সূত্রগুলি প্রায় নীরব,—তাম্রশাসনগুলিতে চুক্তি-সংক্রান্ত তথ্যের এই বিরলতা কার্যত চুক্তি প্রথার অনুপস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়।*"

সামন্ত-প্রথার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের কারণ হিসেবে *শর্মা* প্রমুখ সপ্তম-একাদশ শতকে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের যে তত্ত্ব পেশ করেছেন গবেষক *ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়*, ড. *ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*, ড. *রণবীর চক্রবর্তী* প্রমুখ তা খণ্ডন করেছেন। সমকালীন লেখমালাতে মণ্ডপিকা'র (মণ্ডপ) উল্লেখ থেকে এঁরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, উত্তর-ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেই এগুলির ব্যবহার হত। খ্রীষ্টীয় ৬০০ শতকের আগে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বাণিজ্য সচলতা

অনুমান করা হয়, আদি মধ্যযুগের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেই মণ্ডপিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। গবেষক চট্টোপাধ্যায় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের বিভিন্ন লেখ বিশ্লেষণ করে রাজস্থান অঞ্চলে বহু মণ্ডপিকা অবস্থানের প্রমাণ পেয়েছেন। উত্তর-ভারতের 'মণ্ডপিকা'র মতই দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে 'নগরম'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক চক্রবর্তী আদি-মধ্যযুগের দক্ষিণ-ভারতের দুটি প্রভাবশালী বণিকসংঘের উল্লেখ করেছেন। '*মনিগ্রাসম্*' ও '*নানাদেশী*' নামক এই বণিক সংগঠন দুটি অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে সক্রিয় ভূমিকা নিত

---

১. *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে—ড. রণবীর চক্রবর্তী, পৃঃ ১৬৪।*

বলে অধ্যাপক চক্রবর্তী লেখমালার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন। একইভাবে দূরপাল্লার বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতির তত্ত্বটিকেও অস্বীকার করা হয়েছে। শর্মা, যাদব প্রমুখ ভারত-রোম বাণিজ্যের সংকোচনকে ভারতে সামন্ত-প্রথার উদ্ভবের অন্যতম উপাদান হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু ড. *রণবীর চক্রবর্তী* প্রমুখ মনে করেন, সপ্তম শতকে ভারত-রোম বাণিজ্য সংকুচিত হলেও, সাধারণভাবে বাণিজ্যের সংকোচন ঘটে নি। ইসলামের উদ্ভব ও প্রসারের ফলে ভূমধ্যসাগরে ইসলামের আধিপত্যের কারণে বাণিজ্যের রূপটি পরিবর্তিত হয়েছিল। অতঃপর আরব বণিকদের মাধ্যমে পশ্চিম-এশিয়া থেকে রওনা হয়ে বাণিজ্য-জাহাজগুলি ভারতের বন্দর ছুঁয়ে চীনে পাড়ি দিত। ড. *চক্রবর্তী*র মতে, সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেও (অর্থাৎ ৩০০-১০০০ খ্রীঃ) বাণিজ্যের সজীবতা বজায় ছিল।

নগরায়ণের অবক্ষয় সম্পর্কে *শর্মা, যাদব, ঝা* প্রমুখের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন গবেষক *ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়*।[1] বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্য থেকে ড. *শর্মা* প্রমুখ যেমন পঞ্চম-দশম শতকে নগরের অবক্ষয়ের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, তেমনি লেখমালার ভিত্তিতে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে, আদি-মধ্যযুগে অনেকগুলি কেন্দ্র নগরের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলেও বহু নগরের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল বলে

সজীব নগরের অস্তিত্ব

শ্রীচট্টোপাধ্যায় মতপ্রকাশ করেছেন। আদি-মধ্যযুগের কয়েকটি সজীব নগর হিসেবে উত্তর-প্রদেশের অহিচ্ছত্র, অত্রঞ্জিখেড়া, রাজঘাট, বিহারের চিরন্দ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে পেহোয়া, গোপাদি (গোয়ালিয়র) প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল তত্ত্বানন্দপুর। গবেষক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, আদি-মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্যের ও কৃষির প্রসার নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাঁর মতে, এগুলি ছিল তৃতীয় দফার নগরায়ণের অন্তর্গত [প্রথমপর্বে সিন্ধু-উপত্যকার হরপ্পা-সংস্কৃতিতে, দ্বিতীয় পর্ব খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক।]

বস্তুত ভারতে আদি-মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের আদলে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। পশ্চিম ইউরোপের আর্থ-সামাজিক চরিত্র এবং ভারতের পরিস্থিতি এক ছিল না। যে মাপকাঠিতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব, অবস্থান ও প্রসারের হিসেব করা হয়, ভারতের আদি-মধ্যযুগে সেগুলির স্পষ্ট কোন চরিত্র ছিল না। নগরের উত্থানের গতি শ্লথ হলেও তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি, বাণিজ্যের ধারা নতুনরূপে বহমান ছিল, কৃষিক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী বা ভূস্বামীশ্রেণীর উদ্ভব ঘটলেও তারা একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না। তাই বলা চলে, আদি-মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আক্ষরিক অর্থে সামন্ততন্ত্র সম্ভবত ছিল না, তবে সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক সম্পর্ক ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

---

1. *Trade and urban centers in early Medieval Northern India—Indian Historical Review, 1974.*